প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনায়

যখন তুমি তরুণ

আবদুল আজিজ আশ-শিন্নাভি

অনুবাদ : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

জ্ঞানার্জন : অবশ্যকর্তব্য	১১
সৎসঙ্গ নির্বাচন	২১
সত্যবাদিতা	৩৪
মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া	৪০
আমানত রক্ষা	৪৭
অনুমতি নিয়ে প্রবেশ	৫২
ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ	৬০
সদাচরণ	৬৮
খাওয়ার আদব	৭৫
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ	৮২
সৎকাজে সাহায্য	৮৬
ছোটো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা	১০৩
হারাম থেকে বেঁচে থাকা	১০৮
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	১১৭
কুরআন আল্লাহর কালাম	১২৪
পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ	১৩০
সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ	১৪০
সাদাকা : গরিবের হক	১৪৬
সালাত : ধর্মের ভিত্তি	১৫২

জ্ঞানার্জন : অবশ্যকর্তব্য

এটা তো খুবই প্রসিদ্ধ কথা, জ্ঞান হৃদয়-মনকে আলোকিত করে। আর জ্ঞানার্জন করতে হয় শেখার মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে নাজিল হওয়া সর্বপ্রথম শব্দ হচ্ছে 'ইকরা' তথা পড়ো! সূরা আলাকের প্রথম আয়াতে শব্দটি রয়েছে— 'পড়ো তোমার রবের নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন।' সুতরাং নবিজির ওপর নাজিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত হলো 'পড়ো'। যারা শেখে ও শেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে, তারা জীবিত। পক্ষান্তরে যারা শেখে না, তারা মৃত।

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হওয়া যায়। একই সাথে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে সে অপরকেও উপকৃত করতে পারে। স্বয়ং আল্লাহই আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন—'বলো, হে আমার প্রভু, আপনি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।'[১]

অন্যত্র তিনি বলেন—'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?'[২] সূরা মুজাদালার ১১ নং আয়াতে এসেছে—'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।' সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে— 'বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।' এই আয়াতে বলা হচ্ছে, যাদের জ্ঞান যত বেশি, তাদের তাকওয়া তত বেশি। শুধু তাকওয়াই নয়, আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও আমরা এটি প্রমাণ পাই। আমরা দেখি, যারা যত শিক্ষিত, তাদের আচার-আচরণ তত মার্জিত। তোমরাও তোমাদের আশপাশে এমন অনেক উদাহরণ দেখতে পাবে।

সাহাবি আবু দারদা (রা.) বলেন—'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম তালাশের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে নিয়ে যান।'

ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশতাগণও তাঁদের পাখা নামিয়ে দেন। আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে; এমনকি পানিতে মাছ পর্যন্ত আলিমের জন্য ইস্তেগফার করে। একজন আবেদের ওপর একজন আলিমের ফজিলত ঠিক ততখানি, নক্ষত্রপুঞ্জের ওপর চাঁদের ফজিলত যতখানি। আলিমগণ হলেন আম্বিয়া কিরামের ওয়ারিশ। নবিগণ তো

---

[১] সূরা ত্বহা : ১১৪

[২] সূরা জুমার : ৯

মিরাস হিসেবে দিনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা মিরাস হিসেবে রেখে যান ইলম। আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে তো পূর্ণ হিস্‌সা লাভ করল।'[৩]

উপরিউক্ত হাদিসে জ্ঞানার্জনকে জান্নাত লাভের উপায় বলা হয়েছে। এতে করে মানুষ যেন ইলম অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়। তা ছাড়া, একজন মানুষকে জান্নাত লাভের জন্য কত্ত কোশেশ করতে হয়, কত্ত কিছু বাদ দিতে হয়, কত্ত কিছু থেকে বিরত থাকতে হয়, কতশত আমল করতে হয়। তারপরও কিন্তু জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অথচ দেখো, একজন তালিবে ইলমের জন্য জান্নাত লাভের ব্যাপারটি কত সহজ করে দিলেন আল্লাহ তায়ালা! জ্ঞান অর্জনের পথে বিচরণ শুরু করামাত্রই তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আসমান-জমিনের সবার/সবকিছুর দুআ তো পাওয়া যাচ্ছেই।

নবিজির ইন্তেকালের পর লোকেরা জীবন-জীবিকা ও ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একদিন আবু হুরায়রা (রা.) মদিনার বাজার অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বাজারে দাঁড়িয়ে বললেন, শোনো বাজারের লোকরা! কীসে তোমাদের অপারগ করল?

তারা বলল, আপনি কীসের কথা বলছেন?

তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহর মিরাস বণ্টন হচ্ছে, আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন?

তারা বলল, ওখানে বলতে কোথায়?

তিনি বললেন, মসজিদে।

এ কথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রা (রা.) দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর তারা ফিরে এলো। তারপর তিনি তাদের বললেন, তোমরা কী করলে, ফিরে এলে যে?

তারা বলল, হে আবু হুরায়রা! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম; কিন্তু কই! কোনো কিছু বণ্টন হচ্ছে না দেখলাম।

আবু হুরায়রা (রা.) তাদের বললেন, তোমরা গিয়ে মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি?

তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা দেখেছি কিছু লোক সালাত আদায় করছে। আর কিছু লোক কুরআন পড়ছে। আবার কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে।

---

[৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৩

তখন আবু হুরায়রা (রা.) তাদের বললেন, আফসোস তোমাদের জন্য! ওটাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাস (উত্তরাধিকার)।[৪]

আবু হুরায়রা (রা.) আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা জ্ঞান অর্জন করো। কীভাবে জ্ঞানার্জন করতে হয়, সেটাও শিখে নাও। আর উসতাজের তাজিম করো।[৫]

নবিজির খাদেম আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আরেক হাদিসে এসেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, ফিরে আসার আগপর্যন্ত সে আল্লাহর পথে থাকে।[৬]

আসো এবার আমরা ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর ছাত্রজীবনের দিকে তাকাই। দেখব, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও মেধাবী। পড়ার সময় বইয়ের এক পৃষ্ঠা দিয়ে অপর পৃষ্ঠা তিনি ঢেকে নিতেন। কারণ, যাতে আগের পৃষ্ঠার পূর্বে পরের পৃষ্ঠা মুখস্থ হয়ে না যায়! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এতটাই মেধা দান করেছিলেন যে, তিনি কোনো কিছু দেখামাত্র তা মুখস্থ হয়ে যেত।

ছোটোবেলায় তিনি মদিনায় ইমাম মালেকের দারসে অংশগ্রহণ করতেন। ইমাম মালেক (রহ.) একবার মসজিদে নববিতে বসে দারস দিচ্ছিলেন। সেদিন তিনি ছাত্রদের শেখাচ্ছিলেন নবিজির ৪০টি হাদিস। হঠাৎ তার নজর পড়ল ছোটো ইমাম শাফেয়ির দিকে। তিনি দেখলেন, সে কিছু একটা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে।

দারস শেষে তিনি তাকে ডাকলেন। বললেন, হে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস! আমি দারস দেওয়ার সময় তুমি মনোযোগী না হয়ে মাটি দিয়ে খেলা করছিলে কেন? উত্তরে ছোটো শাফেয়ি বলল—উসতাজ, আমি খেলা করছিলাম না। আমার তো কোনো কলম নেই। তাই আপনি যা পড়াচ্ছিলেন, সেটা একটি ছোটো ডাল দিয়ে মাটিতে লিখে নিচ্ছিলাম, যাতে ভুলে না যাই।

ইমাম মালেক (রহ.) বললেন—আচ্ছা, ধরলাম তুমি সত্য বলেছ। তাহলে আমার শেখানো দু-একটি হাদিস বলে শোনাও তো। ইমাম শাফেয়ি সেদিন উসতাজের শেখানো ৪০টি হাদিস একদম হুবহু শুনিয়ে দিলেন!

ইসলামের শুরুর দিকে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। নবিজি প্রায়ই আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমার লোকেরা ক্ষুধার্ত। আপনি তাদের

---

[৪] *তাবরানি* : ২/১১৪

[৫] *তাবরানি*

[৬] জামে আত-তিরমিজি

খাবারের ব্যবস্থা করুন। আমার উম্মত বস্ত্রহীন। আপনি তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করে দিন।

এতটা দরিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও বদর যুদ্ধে বন্দি কুরাইশদের তিনি কোনো প্রকার আর্থিক মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেন। মুক্তি লাভের জন্য নবিজি তাদের ওপর জুড়ে দেন এক অভূতপূর্ব শর্ত। তিনি বলেন, প্রতিটি বন্দিকে দশজন নিরক্ষর মুসলমানকে অক্ষরজ্ঞান শেখাতে হবে। তবেই তারা মুক্তি পাবে। জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দেয়, তোমরা তা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই!

ইসলামে জ্ঞানার্জনকে ফরজ করা হয়েছে। নবিজি বলেন, জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক (ফরজ)।[৭] এই হাদিসে 'মুসলিম' শব্দটির মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন একটি বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, কিছু লোকের কী হলো, তারা তাদের প্রতিবেশীকে শিক্ষাদান করে না? তাদের সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে না? এরপর তিনি বললেন, আর ওই লোকের কী হলো, তারা কারও থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না, শিক্ষা নেয় না? এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! লোকেরা যদি প্রতিবেশীকে শিক্ষা না দেয়, আর প্রতিবেশীরা যদি তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে, তবে আমি তাদের আশু শাস্তির ব্যবস্থা করব।[৮]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি নিজ ইলম দ্বারা অন্যকে উপকৃত করে না, তাকে বিচার দিবসে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের ডান্ডাবেড়ি পরাবেন।[৯]

উপরিউক্ত হাদিস থেকে আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয় :

ক. জ্ঞানার্জন প্রত্যেকের জন্য ফরজ।

খ. যে জ্ঞানার্জনে অনীহা দেখাবে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

গ. আবার যে জ্ঞানী নিজ জ্ঞান দ্বারা অন্যকে সমৃদ্ধ করবে না, তাকে জাহান্নামের শিকল পরানো হবে।

এখান থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছে। আর সমস্ত বাধা দূর করে জ্ঞানার্জনের পথকে সুগম করেছে।

নবিজির পূর্বে যে সমস্ত নবি-রাসূল এসেছিলেন, তারাও সবাই জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। জ্ঞানার্জনকে করেছিলেন সবার জন্য উন্মুক্ত। কুরআন বলছে—'আমি

---

[৭] সুনানে ইবনে মাজাহ

[৮] তাবরানি

[৯] সুনানে ইবনে মাজা

তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পুরস্কার কিংবা প্রতিদান চাই না; বরং আমার প্রতিদান তো আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাতে।'[১০]

নবিজি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কারও ভালো চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।[১১] আরও বলেন, বনি আদম মারা গেলে তিনটি ছাড়া তাদের সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলো হলো :

ক. সাদাকায়ে জারিয়া,

খ. উপকারী জ্ঞান, যা থেকে লোকেরা উপকৃত হয় এবং

গ. নেককার সন্তান, যে মৃত মা-বাবার জন্য দুআ করে।[১২]

ইলম অর্জনের পাশাপাশি ছেলেমেয়েরা যেন শিক্ষকদের সম্মান করে, সেটাও তাদের শিক্ষতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব বজায় রেখেই ইলম অর্জন করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বড়োদের সম্মান করার বিষয়টি নবিজি আবশ্যক করে দিয়েছেন। শিখিয়েছেন আলিম-উলামাকে সম্মান করতে। তিনি বলেন, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে বড়োদের শ্রদ্ধা করে না, ছোটোদের স্নেহ করে না এবং আলিমদের যথাযথ শ্রদ্ধা করে না।[১৩] আরও বলেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে, একমাত্র মুনাফিক ছাড়া যাদের সবাই সম্মান করে—

ক. সাদা চুলবিশিষ্ট (বৃদ্ধ) লোক;

খ. জ্ঞানী ব্যক্তি ও

গ. ন্যায়পরায়ণ শাসক।[১৪]

অন্যত্র নবিজি বলেন—এমন একসময় আসবে, তখন কেউ আলিমদের অনুসরণ করবে না। ভদ্র, ধৈর্যশীল ও বিনয়ীদের সাথে ন্যায্য আচরণ করা হবে না। আরবরা আরব হওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তঃকরণ হবে বিদেশিদের মতো। তবে আমি কামনা করি, সেই সময়টা যেন না আসে।[১৫]

উহুদ যুদ্ধে শহিদদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রত্যেকের জন্য আলাদা কবর খোড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তাই নবিজি এক কবরে দুজন করে দাফন করছিলেন। দাফন

---

[১০] সূরা শুআরা : ১০৯

[১১] সহিহ বুখারি

[১২] সহিহ মুসলিম

[১৩] মুসনাদে আহমাদ

[১৪] *তাবরানি*

[১৫] মুসনাদে আহমাদ

করার সময় তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে বেশি কুরআন জানত? দুজনের মধ্যে যে বেশি কুরআন জানত, আগে তাঁকে কবরস্থ করতেন।[১৬]

এবার তোমাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলি, শোনো। ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিনয়ী ও ভদ্র হবে। তারা শিক্ষকের অবাধ্য হবে না। একজন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক হবে রোগী ও ডাক্তারের ন্যায়। রোগী যেমন ধৈর্য সহকারে ডাক্তারের সকল নির্দেশনা মেনে চলে, তেমনই একজন ছাত্রও তার শিক্ষকের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মান্য করবে। পড়াশোনা ছাড়াও জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্র তার শিক্ষককে সাথে পরামর্শ করবে। তার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবে বিনয়ের সাথে। শিক্ষকের সামনে বিনয়ী হতে পারায় বরং সে গর্ববোধ করবে।

ইমাম শাফেয়ি তার শিক্ষকের সামনে অতিরিক্ত বিনয় প্রদর্শন করতেন। এতে অনেকে তার সমালোচনাও করেছে। তিনি সমালোচনার উত্তরে বলেছেন, বিনয়ী হওয়াই তো শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মোক্ষম উপায়।

নবিজির সাহাবি ও চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলিমদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। একবার তাঁর সামনে দিয়ে উটে চড়ে সাহাবি জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কোথাও যাচ্ছিলেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে দেখে বললেন, আমি আপনার উটের লাগাম ধরে নিয়ে যাই। আপনি বরং আরাম করে বসুন।

উত্তরে ইবনে সাবিত বললেন—না, না। আপনি নবিজির ভাই! এমনটা করবেন না দয়া করে।

ইবনে আব্বাস বললেন, কিন্তু নবিজি তো আমাদের বলেছেন, আমরা যেন আলিমদের সম্মান করি।

তখন ইবনে সাবিত বললেন—দেখি, আপনার হাতটা দিন তো।

ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলে ইবনে সাবিত তাঁর হাতে চুমু খেলেন। তারপর বললেন—আর আমাদের বলা হয়েছে, আমরা যেন নবিজির পরিবারকে ভালোবাসি, মহব্বত করি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সব সময় তাঁর উসতাজ খালাফ আল আহমারের পায়ের কাছে বসতেন। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের উসতাজদের তাজিম করতে বলা হয়েছে।

---

[১৬] সহিহ বুখারি

ইমাম শাফেয়ি বলেন, আমি ইমাম মালেকের সামনে বসলে খুব আস্তে করে কিতাবের পৃষ্ঠা ওলটাতাম। যাতে পৃষ্ঠা ওলটানোর আওয়াজে তার অসুবিধা না হয়। আবার তাঁর এক ছাত্র আর-রাবি বলেন, আমি কখনো ইমাম শাফেয়ির সামনে তাঁর সম্মানার্থে পানি পান করতাম না।

একদিন খলিফা আল হাদির এক পুত্র এলো তৎকালীন বিখ্যাত আলিম শুরাইকের কাছে। সে এসে তার সামনে হেলান দিয়ে বসল। এরপর তার কাছে হাদিস বিষয়ে জানতে চাইল। কিন্তু শুরাইক তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। খলিফার পুত্র বারবার প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। কিন্তু শুরাইক তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছিলেন না। এরপর সে বিরক্তি নিয়ে বলল, আপনি কি খলিফার পুত্রদের সাথে এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণই করেন?

জবাবে শুরাইক বললেন, না। তবে আমার কাছে ইলম অনেক দামি বস্তু। এটি অপাত্রে ঢালা উচিত নয়। এ কথার মাধ্যমে তিনি মূলত খলিফার পুত্রের আদবহীন বসার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকের নাম ধরে ডাকা উচিত নয়। স্যার, জনাব, উসতাজ, শাইখ অথবা অন্য কোনো লকবের মাধ্যমে শিক্ষককে সম্বোধন করা উচিত। এমনকি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও তার নাম ধরে কথা বলা উচিত নয়।

ছাত্র তার প্রতি শিক্ষকের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কবিগুরু আহমাদ শাওকি বলেন—

قم للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا
أعلمت أشرف أو أجل من الذي
يبنى وينشئ أنفسا وعقولا

ভাবার্থ : 'শিক্ষকের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়ে দাও। তিনি তো তোমার জন্য নবি-রাসূলের মতো কাজ করছেন। তিনি অন্তরকে কলুষমুক্ত করেন। আর হৃদয়কে করেন আলোকিত। সুতরাং তাঁকে সম্মান করার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

তোমরা তোমাদের শিক্ষকের সামনে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে বসবে। এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না। কোনো আওয়াজে বেখেয়ালি হবে না। হাত-পা কিংবা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। কোনো কারণ ছাড়া হাসবে না। শিক্ষকের কোনো রম্য কথায় যদি হাসতেই হয়, তবে মুচকি হাসবে। শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া তার কক্ষে কিংবা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে না। শিক্ষকের বাসায় যেতে

হলে দরজায় আলতো করে টোকা দিতে হবে। তিনবারের বেশি টোকা দেওয়া যাবে না। দরজা খোলা না হলে ফিরে যেতে হবে।

পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে ক্লাসে। অন্য সকল চিন্তাভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করে তবেই বসতে হবে। এতে শিক্ষকের আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে পূর্ণ ফায়দা। শিক্ষকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে। তখন তার কক্ষে গিয়ে তাকে না পাওয়া গেলে অপেক্ষা করতে হবে। অযথা ডাকাডাকি করা যাবে না।

দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্যতাপে ইবনে আব্বাস (রা.) ইলম অর্জনের জন্য জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর দরজার সামনে বসে থাকতেন। দেখা যেত, জায়েদ (রা.) ঘুমাচ্ছেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে ডাকছেন না। এটা দেখে পথচারীদের অনেকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি তাঁকে ডেকে দিতে পারি। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের বারণ করতেন; বরং জায়েদ (রা.) জেগে না ওঠা পর্যন্ত প্রখর রোদের মধ্যে বসে অপেক্ষা করতেন।

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ করেছে। জ্ঞানার্জন করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। লিঙ্গ-জাতনির্বিশেষে সবার জন্য ইলম অর্জন করা জরুরি। কেননা, একটি সত্যিকারের উন্নত জাতি তো সেটিই, যে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষিত।

তোমরা বয়সে তরুণ। এই বয়সে তোমাদের স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখতে হবে। পিতা-মাতা আদেশ-নিষেধ করবেন সত্য, এটা মেনেই তোমাদের স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া শিখতে হবে। এখন থেকে এটা না শিখলে তখন তোমাদের জীবনটা চলে যাবে অন্যের হাতে। সারাজীবন তো আর তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আগলে রাখতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, তারা যদি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে তোমাদের উপদেশ দেন, তাহলে তাদের মান্য করতে হবে। ভুল হলে অবশ্যই সঠিকটা তাদের সুন্দরভাবে বোঝাতে হবে। এতে তোমাদের মধ্যে তৈরি হবে আত্মবিশ্বাস। এর বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে :

ক. তোমরা বিভিন্ন সমস্যায় স্বকীয়ভাবে ভাবতে এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শিখবে।

খ. পরিবারের বড়োদের পরামর্শ শুনে নিজেদের ভাবনার ভুল ধরতে শিখবে।

গ. যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে।

ঘ. আলোচনা-সমালোচনার নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে শিখবে।

ঙ. সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে দূরে থেকে ব্যক্তিত্ব গঠন করতে শিখবে।

ছোটোরাও বড়োদের মজলিসে বসতে পারে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ব্যক্ত করতে পারে নিজেদের মতামত। এর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নের ঘটনায় :

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তখন অনেক ছোটো। কিন্তু তবু তিনি অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সাথে বসে ছিলেন নবিজির মজলিসে। নবিজি বললেন—গাছের মধ্যে একটি গাছ আছে, যার পাতা কখনো ঝরে যায় না। এই গাছের দৃষ্টান্ত মুসলমানদের মতো। তোমরা কেউ কি গাছটির নাম বলতে পারবে? সকলেই ভাবতে শুরু করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি ধরতে পেরেছিলাম। গাছটি হবে খেজুরগাছ। কিন্তু লজ্জার কারণে বলতে পারিনি। উপস্থিত কেউ বলতে না পারায় শেষতক নবিজিই বলে দিলেন, এই হচ্ছে খেজুরগাছ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, পরে আমি বাবার সাথে ফেরার সময় বললাম—বাবা, নবিজি উত্তরটা বলার আগেই আমি এটা জানতাম। বাবা বললেন—তুমি যদি নবিজিকে উত্তরটা দিতে, তবে তা হতো আমার জন্য দুনিয়ার সব থেকে দামি পাওয়া।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানসিক প্রশান্তি অর্জন এবং আত্মোন্নয়নের পাশাপাশি দেশ-জাতির উন্নয়নে কাজ করা।

আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ও সমাজ-দেশ-জাতির উন্নয়ন সাধন করার তাওফিক দান করুন, আমিন!

সৎসঙ্গ নির্বাচন

তোমাদের এখন অনেক বন্ধু। বন্ধুদের সাথে আড্ডা, কথোপকথন, পড়াশোনা, ঘোরা ইত্যাদিতে তোমাদের একটা বিশাল সময় কেটে যায়। বন্ধু মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। জীবনের একটা বড়ো অংশ বন্ধুদের সাথে কেটে যায়। তাইতো বন্ধুর মাধ্যমেই তোমরা অনেকটাই প্রভাবিত হও। ফলে তোমাদের বন্ধু নির্বাচনে খুব সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধু হিসেবে বেছে নিতে হবে কেবল সৎ ও মার্জিত ব্যক্তিকেই। প্রবাদেই আছে—সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। অন্যত্র বলা হয়েছে, যদি তুমি আমাকে জানতে চাও, তবে আমার বন্ধুকে দেখো। একই কথা কবি তার ভাষায় বলেছেন—

Don't ask about the one,
Ask about his companion.
As everyone likes to follow,
The footsteps of his fellow.

মর্মার্থ : কারও সম্বন্ধে জানতে চাইলে, তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে তার বন্ধুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। কেননা, প্রত্যেকেই তার সঙ্গীকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে পছন্দ করে।

এ ব্যাপারে নবিজি বলেছে, নেককার সাথি ও অসৎ সাথির দৃষ্টান্ত হলো একজন আতর বহনকারী ও একজন কামারের মতো। আতর বহনকারী তোমাকে আতর দেবে। অথবা তুমি তার থেকে ক্রয় করবে। দুটির একটিও না হলে কমপক্ষে তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ

তো পাবেই। আর কামার কী করবে জানো? সে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তার থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করবে।[১৭]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, অসৎসঙ্গ থেকে সাবধান। কেননা, তুমি মানুষের কাছে তার পরিচয়ে পরিচিত হবে।[১৮]

সৎসঙ্গ নির্বাচন শিশু-কিশোরের স্বভাব-চরিত্রকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। তাদের সমাজ ও দেশের জন্য নিবেদিত হতে শেখায়। একজন ভালো বন্ধুর কাছ থেকে সে সত্য ও সুন্দর পথের দিশা পায়। নবিজি বলেন, প্রত্যেকে তার বন্ধুর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তাই বন্ধু নির্বাচনে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।[১৯]

মানুষের জীবনে শৈশব ও কৈশোর দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময়েই ব্যক্তিত্ব গঠন হয়। স্কুলের বন্ধুরা তার জীবনকে প্রভাবিত করে খুব। তাই স্কুলের বন্ধুরা ভালো হলে সে তা-ই হবে। আর মন্দ হলে সে তাকেই অনুকরণ করবে। আনন্দময় মুহূর্ত কিংবা সংকটময় পরিস্থিতিতে একজন বন্ধু সব সময় অন্য বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। বন্ধুর বৈশিষ্ট্য বন্ধুর মধ্যে গভীরে পৌঁছে। এতটাই গভীরে যে, একটা সময় দেখা যায়, ভালো বন্ধুর হাত ধরে সেও ভালো হয়েছে। আবার বখে যাওয়া সঙ্গীর পেছনে পেছনে থেকে সেও হয়েছে বিপথগামী।

এজন্য তোমাদের উচিত, খারাপ ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। অনেকগুলো খারাপ বন্ধুর চাইতে একজন ভালো বন্ধু অনেক বেশি উত্তম। সে তাকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করবে। আর মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে।

এ নিয়ে চমৎকার একটি গল্প আছে। একবার এক বাবা তার ছেলেকে সৎসঙ্গ নির্বাচনের গুরুত্ব বোঝাতে চাইলেন। এজন্য তিনি ছেলেকে এনে দিলেন বাক্সভর্তি আপেল। তারপর সেই বাক্সে একটি পচা আপেল রেখে দিলেন। তারপর ছেলেকে বললেন, কিছুদিন পর আমরা বাক্স খুলে আপেলগুলোর অবস্থা দেখব।

কিছুদিন পার হয়ে গেল। তারপর বাবা-ছেলে মিলে বাক্সের কাছে গেল সেগুলোর অবস্থা দেখার জন্য। কাছাকাছি যেতেই উৎকট পচা গন্ধে তারা নাক টিপে ধরল। এই তীব্র গন্ধ সেই বাক্স থেকে বেরোচ্ছিল। বাক্স খুলে দেখা গেল, ভেতরের সমস্ত আপেল পচে গেছে। এরপর বাবা ছেলেকে বললেন, একই অবস্থা তোমারও হবে, যদি তুমি খারাপ বন্ধুর সাথে মেলামেশা করো।

---

[১৭] সহিহ মুসলিম
[১৮] *ইবনে আসাকির*
[১৯] জামে আত-তিরমিজি

তোমারা শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করো। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তোমাদের দায়িত্ব হলো, উপযুক্ত বন্ধু নির্বাচন করা। উত্তম বন্ধু বাছাই করতে বিজ্ঞদের থেকে পরামর্শ চাওয়া। কারণ, এ বয়সে তোমরা বন্ধুদের সাথে সবচাইতে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করো। একসঙ্গে সময় কাটাও, খেলাধুলা করো, পড়াশোনা করো। একে অন্যের বাসায় যাও, অসুস্থ হলে দেখতে যাও। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা আদান-প্রদান করো। মানসিকভাবে একে অন্যকে সাপোর্ট করো।

উত্তম বন্ধু বাছাইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

উত্তম বন্ধু সবার ভাগ্যে সহজে জোটে না। তাদের বাছাই করে নিতে হয়। এই বাছাইয়ে যারা সফলতা দেখাতে পারে, দিনশেষে তারাই সফল হয়। আমরা এখন উত্তম বন্ধুর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের বন্ধুতে খুব সহজেই বাছাই করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

ক. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

নবিজি বলেন, বন্ধু মনে করে কারও সঙ্গে একেবারে অতি ঘনিষ্ঠ হতে যেয়ো না। কারণ, হতে পারে সে-ই একদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। আবার কাউকে শত্রু মনে করে ঘৃণা করো না। কারণ, হতে পারে সে-ই একদিন তোমার বন্ধু হবে।[২০]

নবিজি আরও বলেন, কাউকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করার সময় তার এবং তার বাবার নাম জেনে নেওয়া দরকার। এতে করে উভয়ের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া সৃষ্টি হবে।[২১] অন্যত্র বলেন, এক বন্ধুর প্রতি অন্য বন্ধুর হক আছে। আর সেই হক হচ্ছে, সে তার বংশপরিচয় জানবে। তার অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করবে। অসুস্থ হলে দেখতে যাবে, মারা গেলে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করবে।[২২]

ধরো কাউকে বন্ধু হিসেবে তোমার পছন্দ হলো। তখন তুমি কী করবে? তখন তুমি তাকে বিষয়টি জানিয়ে দেবে। এ প্রসঙ্গে নবিজি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে সে যেন তা তাকে জানিয়ে দেয়।[২৩] একই হাদিস সাহাবি আবু জর (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে, কেউ কাউকে ভালোবাসলে, সে যেন তাকে শুধু এই ভালোবাসার কথা জানানোর জন্য তার বাসায় যায়।[২৪]

---

[২০] জামে আত-তিরমিজি

[২১] জামে আত-তিরমিজি

[২২] সুনানে বায়হাকি

[২৩] সুনানে আবু দাউদ

[২৪] মুসনাদে আহমাদ

সর্বোত্তম বন্ধুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নবিজি বলেন—সর্বোত্তম বন্ধু হলো সে, যে তার বন্ধুকে আল্লাহর স্মরণে সাহায্য করে। আবার ভুলে গেলে তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৫]

তিনি আরও বলেন—সর্বোত্তম সঙ্গী তো সে, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। যার সঙ্গে কথা বললে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যাকে দেখলে আখিরাতের কথা মনে পড়ে।[২৬] অন্যত্র বলেন, মুমিন ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। মুত্তাকি ছাড়া কাউকে তোমার প্লেট থেকে খেতে দিয়ো না।[২৭]

একবার এক লোক নবিজিকে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! সঙ্গী হিসেবে কে উত্তম? নবিজি বললেন, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, সে তোমার উত্তম বন্ধু। আবার যার সঙ্গে কথা বললে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সে তোমার উত্তম বন্ধু। একইভাবে যার কাজ দেখলে তোমার আখিরাতের কথা স্মরণ হয়, সেও তোমার উত্তম বন্ধু।

আরেকবার নবিজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমরা সঙ্গী হিসেবে কাকে নির্বাচন করব? তিনি উত্তর দিলেন, এমন কাউকে সঙ্গী বানাও, যার কথা তোমার জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আবার যার আমল তোমাকে আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যার আচরণ তোমাকে দুনিয়াবিমুখ করে দেয়।[২৮]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, তোমরা জ্ঞানীদের সাহচর্য অবলম্বন করো। কোনো কিছু জানতে চাইলে জ্ঞানীদের থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। বিজ্ঞজনদের সাথে ওঠাবসা করো।[২৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, জান্নাতে জহরতের তৈরি কিছু পিলার আছে। আবার সেগুলোর ওপরে কক্ষ বানানো হয়েছে মূল্যবান সবুজ মণি দিয়ে। সেসব কক্ষের দরজাগুলো উজ্জ্বল মণি-মুক্তা দিয়ে বানানো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে রাসূল! সেখানে কারা থাকবে? তিনি উত্তর দিলেন, যারা একে অন্যকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, একে অন্যের সাথে আল্লাহর জন্য ওঠাবসা করে এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য সৎসঙ্গ অবলম্বন করে তারাই।

একবার নবিজি বলেন, এমন কিছু বান্দা আছে, যারা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতপ্রাপ্ত। তারা নবিও না, শহিদও না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তারা কারা? আর কী কারণে তাদের এই বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হলো? নবিজি উত্তর দিলেন, তারা একে অন্যকে

---

[২৫] *ইবনে আবিদ দুনিয়া*

[২৬] ইবনে আব্বাস

[২৭] মুসনাদে আহমাদ

[২৮] *ইবনে নাজ্জার*

[২৯] রাব্বাহ

শুধুই আল্লাহর জন্য ভালোবাসে; যদিও তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা কিংবা লেনদেনের সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহর কসম! তাদের চেহারা হবে নুরান্বিত। তারা অবস্থান করবে নুরের মধ্যে। অন্য সবাই যখন ভয়ে তটস্থ থাকবে, তারা হবে ভয়হীন। সবাই যখন চিন্তিত থাকবে, তখন তাদের কোনো চিন্তা থাকবে না। এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন—'শুনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই। আর তারা পেরেশানও হবে না।'[৩০]

খ. সালাম দেওয়া

ছোটোবেলা থেকেই তোমাদের সালামের তালিম নিতে হবে। কারও সঙ্গে দেখা হলে আগে সালাম দিতে হবে, এই অভ্যাস থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে নবিজি বলেন—সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালোবাসা রাখবে। আমি কি তোমাদের এমন কাজ বলে দেবো না, যখন তোমরা তা করবে এবং একে অপরকে ভালোবাসবে? তা হলো, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার করো।[৩১]

আরেকবার এক ব্যক্তি নবিজিকে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোনো কাজটি উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।[৩২]
সালামের পদ্ধতি : ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, একটি লোক নবিজির নিকট এলো। এসে এভাবে সালাম করল, আসসালামু আলাইকুম। আর নবিজিও তার জবাব দিলেন।

এরপর লোকটি বসে গেলে তিনি বললেন, ওর জন্য দশটি নেকি। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ' বলে সালাম পেশ করল। নবিজি তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। সে বসে গেল তিনি বললেন, ওর জন্য বিশটি নেকি।

তারপর আর একজন এসে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ' বলে সালাম দিলো। তিনি তার জবাব দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, ওর জন্য ত্রিশটি নেকি।[৩৩]

এই হাদিসে আমরা দেখতে পাই, সালাম যত দীর্ঘ করে দেওয়া হবে, নেকি তত বেশি পাওয়া যাবে। তোমাদের জানা থাকা দরকার, যে আগে সালাম দেয়, তার মর্যাদা

---

[৩০] সূরা ইউনুস : ৬২ (সুনানে বায়হাকি)
[৩১] সহিহ মুসলিম
[৩২] সহিহ বুখারি
[৩৩] মুসনাদে আহমাদ : ১৯৪৪৬

অনেক বেশি। নবিজি বলেন, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি অধিক উত্তম, যে আগে সালাম দেয়।[৩৪]

আবার কে কাকে সালাম দেবে জানো? আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন—আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্পসংখ্যক অধিকসংখ্যককে সালাম দেবে।[৩৫]

একবার বিদায় নেওয়ার পরে আবারও দেখা হলে করণীয় হলো সালাম দেওয়া। এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে নবিজি বলেন—যদি তোমাদের কেউ কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন অবশ্যই তাকে সালাম দেয়। এরপর বিদায় নেওয়ার পর কোনো গাছ, দেওয়াল কিংবা পাথরের মাধ্যমে আড়াল হওয়ার পর দেখা হলে আবারও তারা যেন সালাম বিনিময় করে।[৩৬]

শিশুদের সালাম দেওয়া জরুরি। ইসলামে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। আনাস (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ খেলাধুলায় ব্যস্ত কয়েকটি ছোটো ছেলের পাশ দিয়ে যান। যাওয়ার সময় তাদের সালাম করেন।[৩৭]
তিনি আরও বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ আমাদের কাছে আসেন। তখন আমি ছিলাম ছোটো বালক। এ সময় তিনি আমাদের সালাম দেন। তারপর আমার হাত ধরে একটা কাজে পাঠিয়ে দেন। আর আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি একটি দেওয়ালের ছায়ায় বসে থাকেন।[৩৮]

আহলে কিতাবদের সালাম দেওয়া : আচ্ছা যারা আহলে কিতাব অর্থাৎ যারা ইহুদি ও খ্রিষ্টান, তাদের কি সালাম দেওয়া যাবে? আসো দেখি নবিজি কী বলেছেন এ বিষয়ে। একবার সাহাবিগণ নবিজিকে জিজ্ঞাসা করেন—আহলে কিতাবগণ (ইহুদি-নাসারারা) আমাদের সালাম করে, আমরা তাদের সালামের জবাব কীভাবে দেবো? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা শুধু ওয়ালাইকুম বলবে।

আরেকবার নবিজি বলেন—যখন ইহুদিরা তোমাদের সালাম করে, তখন তারা বলে, আস-সামু আলাইকুম। এর অর্থ তোমরা মরো। তারা আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক বলে না। কাজেই তোমরা এদের সালামের জবাবে বলবে, ওয়া আলাইকুম। এর অর্থ হলো, বরং তোমরা মরো।

---

[৩৪] সুনানে আবু দাউদ
[৩৫] সহিহ বুখারি : ৬২৩১
[৩৬] সুনানে আবু দাউদ
[৩৭] সুনানে আবু দাউদ
[৩৮] সুনানে আবু দাউদ

এ প্রসঙ্গে আরেকটি চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। সুহাইল ইবনে আবু সালিহ (রহ.) বলেন, একবার আমি আমার পিতার সাথে শাম দেশে যাই। তখন লোকেরা নাসারাদের গির্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম করে। এ সময় আমার পিতা বলেন, তোমরা তাদের আগে সালাম করবে না। কেননা, আবু হুরায়রা আমাদের কাছে এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা ইহুদি ও নাসারাদের আগে সালাম করবে না। আর তাদের সাথে তোমাদের রাস্তায় দেখা হলে তাদের সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে বাধ্য করবে।[৩৯]

আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোনো দল কোথাও যায়, তখন তাদের একজন সালাম দিলেই যথেষ্ট হবে। আর বসা লোকদের মধ্য থেকে একজন সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট; সকলের সালাম দেওয়া বা সালামের জবাব দেওয়া জরুরি নয়।

মুসাফাহা (করমর্দন) : নবিজি বলেছেন, যখন দুজন মুসলিম মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তখন তিনি তাদের মাফ করে দেন।'[৪০] একই হাদিস অন্যত্র এভাবে এসেছে, দুজন মুসলিম মিলিত হওয়ার পর মুসাফাহা করলে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আনাস ইবন মালেক (রা.) বলেন, ইয়েমেনের লোকেরা এলে রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমাদের কাছে ইয়েমেনের লোকেরা এসেছে। আর এরা তারা, যারা প্রথম মুসাফাহা করা শুরু করে।[৪১]

মুয়ানাকা (আলিঙ্গন) : আবু জর (রা.) শাম দেশ ছেড়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আমি আপনার কাছে নবিজির একটা হাদিস সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি বলেন, কোনো গোপন ব্যাপার না হলে আমি অবশ্যই তোমাকে বলব। তাঁকে বলা হলো, এটা কোনো গোপন বিষয় নয়। আচ্ছা, আপনারা যখন রাসূলুল্লাহর সঙ্গে দেখা করতেন, তিনি কি আপনাদের সাথে মুসাফাহা করতেন?

আবু জর (রা.) বলেন, যখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান, কিন্তু সে সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমি ঘরে ফিরে জানতে পারি, নবিজি আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই। সে সময় তিনি উঁচু আসনে বসে ছিলেন। এ সময় তিনি আমাকে তাঁর বুকের সাথে মেশান। অর্থাৎ মুয়ানাকা করেন। যা খুবই উত্তম ছিল![৪২]

---

[৩৯] সুনানে আবু দাউদ

[৪০] সুনানে আবু দাউদ

[৪১] সুনানে আবু দাউদ

[৪২] সুনানে আবু দাউদ

সম্মানের জন্য দাঁড়ানো : বনু কুরাইজার লোকেরা সাদ (রা.)-এর নির্দেশে তাদের দুর্গ পরিত্যাগ করে বাইরে এলে রাসূলুল্লাহ সাদ (রা.)-কে ডাকেন। তিনি একটি সাদা রঙের গাধায় চড়ে সেখানে উপস্থিত হন। তখন নবিজি তাদের বলেন, তোমরা তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও। অথবা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে উঠে যাও। এরপর সাদ (রা.) এসে রাসূলুল্লাহর পাশে বসেন।[৪৩]

নিজের বাচ্চাদের চুমু দেওয়া : আল আকরা নামের এক লোক রাসূলুল্লাহকে হুসাইন (রা.)-কে চুমু দিতে দেখে বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি কাউকে এমন আদর করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ তাকে বলেন, যে ব্যক্তি রহম করে না, তার প্রতি রহম করা হয় না।[৪৪]

দু-চোখের মাঝখানে চুমু খাওয়া : আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানগণ খায়বার যুদ্ধের দিন মদিনায় ফিরে আসে। তখন নবিজি জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। তাঁর সাথে মুয়ানাকা (আলিঙ্গন) করেন। আর তাঁর দু-চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে চুমু দেন।[৪৫]

গালে চুমু দেওয়া : বারা (রা.) বলেন, আবু বকর যখন প্রথম মদিনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময় তাঁর মেয়ে আয়িশা (রা.) জ্বরাক্রান্ত হয়ে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর তাঁর কাছে যান। তাঁকে বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি কেমন আছ? এরপর তিনি তাঁর গালে চুমু দেন।[৪৬]

হাতে চুমু খাওয়া : আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমরা নবিজির হাতে চুমু খেতাম।

শরীরে চুমু দেওয়া : উসায়দ ইবনে হুজায়র (রা.) থেকে একজন আনসার সাহাবি ছিলেন। একদিন তিনি লোকদের হাস্য-কৌতুক করে তাদের হাসাচ্ছিলেন। এ সময় নবিজি তাঁর পেটে কাঠ দিয়ে গুঁতা দেন। তখন উসায়দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দিন। নবিজি বলেন—আচ্ছা, তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। উসায়দ বলেন, আপনি তো জামা গায়ে দিয়ে আছেন। আপনি গুঁতা দেওয়ার সময় আমার গায়ে তো জামা ছিল না। নবিজি তখন নিজের জামা ওপরে ওঠালেন। এরপর উসায়দ (রা.) তাঁর পার্শ্বদেশে চুমা দিতে থাকেন। আর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার শরীরে এই চুমা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।[৪৭]

---

[৪৩] সুনানে আবু দাউদ
[৪৪] সুনানে আবু দাউদ
[৪৫] সুনানে আবু দাউদ
[৪৬] সুনানে আবু দাউদ
[৪৭] সুনানে আবু দাউদ

গ. অসুস্থকে দেখতে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমরা বন্দিকে মুক্ত করে দাও, ক্ষুধার্তকে খেতে দাও আর অসুস্থকে দেখতে যাও।[৪৮]

অজু অবস্থায় অসুস্থকে দেখতে যাওয়া : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ উত্তমরূপে অজু করে নেকির আশায় তার কোনো (অসুস্থ) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর খারিফ (সত্তর বছর) পথ দূরে রাখা হবে।[৪৯]

রোগীর সুস্থতা চেয়ে দুআ করা : সাদ (রা.) বলেছেন, আমি মক্কাতে অসুস্থ হলে নবিজি আমাকে দেখতে আসেন। তিনি আমার কপালে হাত রাখলেন এবং বুক ও পেট মলে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! সাদকে রোগমুক্ত করে দিন এবং তাঁর হিজরতকে পূর্ণ করে দিন।[৫০] তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি এমন রোগীকে দেখতে গেল—যার অন্তিম সময় আসেনি, সে যেন তার সামনে সাতবার বলে—

اَسْاَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ-

'আমি মহান আরশের প্রভু মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্তি দেন।'[৫১]

তাহলে তাকে নিশ্চয়ই রোগমুক্তি দেওয়া হবে। অন্য হাদিসে এসেছে, একজন মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে—

১. কারও সঙ্গে দেখা হলে সালাম দেবে,

২. আমন্ত্রণ করলে তা কবুল করবে,

৩. পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে,

৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়লে তার জবাব দেবে। অর্থাৎ, ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে,

৫. পীড়িত হলে তার কাছে গিয়ে খবরাখবর নেবে এবং

৬. ইন্তেকাল করলে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করবে।[৫২]

---

[৪৮] সহিহ বুখারি

[৪৯] সুনানে আবু দাউদ

[৫০] সুনানে আবু দাউদ

[৫১] সুনানে আবু দাউদ

[৫২] সহিহ মুসলিম